১৩ ফেব্রুয়ারি ২০০৮, পাবনার বনমালী ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে সিফাত রহমান সনম-এর 'অপরাজিতার চোখ' কবিতা গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন করেন প্রবীণ সাংবাদিক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব কামাল লোহানী।

ঢাকার বাইরে বইয়ের মোড়ক

– আবুল হোসেন খোকন

ফুল ফুটুক না ফুটুক, দিনটি ছিল বসন্ত। শীত-বসন্তের এই সম্মিলনে বনমালী ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে অনুষ্ঠানটির আয়োজন করা হয়েছিল। বনমালী পাবনার এক ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান, যার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন সেই ইংরেজ আমলে অবিভক্ত ভারতবর্ষের সংস্কৃতজ্ঞ বনমালী রায়। সংস্কৃতিমনা মানুষকে মাটির কাছাকাছি রাখতে, কিংবা সেই মানুষকে তার স্বত্বায় নির্ভয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে এবং সম্মুখযাত্রার সকল বৈরিতাকে দলিত করে এগিয়ে চলার দীক্ষা দিতেই এমন একটি প্রতিষ্ঠান করেছিলেন। নাটক, সঙ্গীতচর্চা এবং সংস্কৃতির আদি-অকৃত্তিম ধারাকে অবলম্বন করে এগিয়ে যাবার এমন বিচরণক্ষেত্র গড়ার মানুষ খুব কমই দেখা যায়। কিন্তু বনমালী রায় সে দায় নিয়ে সাধারণ মানুষের অবারিত যাত্রাপথ স্থাপন করেছিলেন। এই যে মহতি উদ্যোগ তার মূল শর্ত ছিল– এই প্রতিষ্ঠান হবে সংস্কৃতিমনা সাধারণ মানুষের। এতে ধর্ম-বর্ণ-জাত-পাত নির্বিশেষে সবাই যুক্ত হতে পারবেন, এবং এই প্রতিষ্ঠানকে কখনই মূলধারা থেকে বিচ্যুত করা যাবে না। সেই থেকে শত বসন্ত পেরিয়ে এই কিংবদন্তীর এগিয়ে চলা। আজও চলছেই। যদিও এর কর্তৃত্ব যখন থেকে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় বিশেষ গোষ্ঠীর কব্জায় চলে গেছে– তখন থেকে মূলধারাটি আর রক্ষা হয়নি। তারপরেও অনেক বসন্ত পার করে আসছে বনমালী।

ফাগুনের আগুনজ্বলা ২০০৮-এর বসন্তদিনের ওই বিকেলটি ছিল অন্য রকম। যার জন্য আমরা তিনজন ঢাকা থেকে সাত-সকালে রওয়ানা হয়েছিলাম। খ্যাতিমান প্রবীণ সাংবাদিক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব কামাল লোহানী ছিলেন ওই অন্যরকম দিনটির প্রধান অতিথি। আমরা যাচ্ছিলাম পাবনার তরুণ কবি সিফাত রহমান সনম-এর 'অপরাজিতার চোখ' কবিতাগ্রন্থের প্রকাশনা উৎসবে। সঙ্গে তাই ছিলেন গ্রন্থটির প্রকাশক 'মা মুদ্রণ'-এর স্বত্বাধিকারী অমল কান্তি সরকারও। বাসের ভিতরে ভাবছিলাম– যেখানে মোড়ক উম্মোচনের ব্যাপারটি প্রধান্য পায় রাজধানী ঢাকায়, প্রাধান্য পায় রমনার বটমূলে একুশের বইমেলায়– সেখানে আমার চলেছি দূর মফস্বল শহরে, ঢাকার বাইরে। যদিও 'অপরাজিতার চোখ' গ্রন্থটির মূদ্রণ হয়েছে ঢাকা থেকেই। কিন্তু এর মোড়ক উম্মোচন হচ্ছে পাবনায়। কারণ একটাই। তরুণ কবি পাবনার মাটির মানুষ। আর আমরা যারা যাচ্ছি তারাও পাবনার মাটির মানুষ। মাটি, মানুষ আর জন্মভূমির টানে তাই অন্য এক আকর্ষণে ছুটে চলেছিলাম ঢাকার বাইরে। শুধু প্রকাশনা অনুষ্ঠান নয়, লোভটা ছিল আরও নানা জায়গায়। ভাবা যায়ঃ একদিন এই মাটিতে কতো স্মৃতির গাঁথুনী ছিল! কামাল লোহানী ভাই তো সেই পাকিস্তান আমলে এখানে '৪৮-'৫২-এর ভাষা-সংস্কৃতির আন্দোলনের কারিগর ছিলেন। 'শিখা' নামের সংস্কৃতি সংগঠনের ব্যানারে কী বিশাল সাংস্কৃতিক আন্দোলন রচনা করেছিলেন! মানুষকে জাগ্রত করেছিলেন বিপবের মন্ত্রণায়! দীক্ষা দিয়েছিলেন নতুন সমাজ এবং জীবনপথ রচনার। আর আমরা তার ধারাবাহিকতা রক্ষায় '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের পর, বিশেষ করে সামরিক শাসন এবং স্বৈরশাসনের যাতাকল থেকে মুক্তিযাত্রার পথ সুগম করতে চেয়েছি। জেল, জুলম, নির্যাতন আলিঙ্গন করে মানুষের অন্তরাত্মাকে শাণিত করতে চেয়েছি। কতো ঝড়, কতো তাণ্ডব, কতো বিপর্যয়-জয়কে ধারণ করে এগিয়ে চলার সে চেষ্টা! উদীচী, গণশিল্পীসহ প্রায় এক ডজন নাট্য ও সাংস্কৃতিক সংগঠন চেষ্টা করেছে অগ্নিদিনের অগ্নিশিখা ছড়িয়ে দিতে। গণসঙ্গীত, গণনাটক, গণনৃত্য, কবিতা, আবৃত্তি, সভা-সমাবেশ-সেমিনার, বৈঠক-মিছিল, সিনেমা-পোস্টার-কার্টুন-আলোকচিত্র, লেখনী কোনটাই বাদ যায়নি। সব নিয়ে মাঠে নেমে ওই অগ্নিদিনের অগ্নিঝরা শিখা জ্বালতে চেয়েছি। এমনিতেই শোষণ-শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে পাবনার নাম ছিল শীর্ষ স্থানে। একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হবার আগেই ১৯৬৮ সালে এখানে সশস্ত্র যুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছিল। ভাতের বদলে ভুট্টা খাওয়ানোর চেষ্টা করেছিল পাকিস্তানি শাসকরা। এ নিয়ে দেশে একটা আন্দোলন শুরু হযেছিল। আর পাবনায় ঘটেছিল সশস্ত্র বিদ্রোহ। বন্দুকের দোকান লুট করে ক্যাপ্টেন জায়েদি নামে এক মুসলিম লীগ নেতার বাড়ির ওপর ছাত্র-জনতা আক্রমন করেছিল। মুসলিম লীগের সশস্ত্র গুণ্ডা এবং পুলিশ বাহিনীর মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে দিন-দুপুরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা যুদ্ধ করেছিল ছাত্র-জনতা। এরকম আরও অনেক ইতিহাস রয়েছে পাবনাবাসীর। ১৯৭১ সালেও পাক বাহিনী প্রথম পরাজিত হয়েছিল পাবনায়। ২৬ মার্চ থেকে দুইদিনব্যাপী যুদ্ধ করে মুক্ত করা হয়েছিল শহরকে। তারপর ১১ দিন স্বাধীন ছিল গোটা জেলা। '৮২ সালে জেনারেল এরশাদ যখন ক্ষমতা দখল করেছিল, তখনও এখানকার ছেলেরা আগে-ভাগে প্রতিবাদে ফেঁটে পড়েছিল। এরশাদ হটাও আন্দোলন শুরু হবার পর গোটা দেশের মধ্যে সর্ব প্রথম এখানে এক প্রতিমন্ত্রীর জনসভা ভেঙে, তার গাড়ি গুড়িয়ে দিয়েছিল ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ। শত শত পুলিশ দিয়েও ওই মন্ত্রি সমাবেশ করতে পারেনি। শুধু ছাত্র-জনতা কেন– যারা গান গায়, নাটক করে, ছবি আঁকে– এমন শিল্পীরাও এখানে জরুরি আইন ভেঙেছিল দেশের ভেতর সর্বপ্রথম ১৯৮৭ সালের ২৮ নভেম্বর।

'৮০-এর দশক জুড়ে পাবনায় কয়েকটি নাট্য ও সাংস্কৃতিক সংগঠন ইতিহাস সৃষ্টি করেছিল। এগুলো হলো থিয়েটার-৭৭, অনুশীলন আশি, মহিলা পরিষদ, খেলাঘর আসর, ড্রামা সার্কেল, আবৃত্তি সংসদ, উদীচী শিল্পী গোষ্ঠী আর গণশিল্পী সংস্থা। এদের আদর্শ ও লক্ষ্য ছিল গণতন্ত্র ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন এবং সমাজ

বিপবের জন্য শ্রেণী সংগ্রামের ক্ষেত্র রচনা। চেতনার মশাল জ্বালার জন্য এরা কাজ করতো শহরের স্কুল, কলেজ, বিভিন্ন সভা-সমাবেশ, মঞ্চ, রাজপথ, গলিপথ, ফুটপাত এবং গ্রামে। শহরে কাজ হতো সাধারণ মানুষের মধ্যে এবং গ্রামে হতো কৃষক-শ্রমিক-মজুরের মধ্যে। কাজের হাতিয়ার ছিল নাটক, গণসঙ্গীত, জাগরণমূলক গণনৃত্য-কবিতা, বক্তব্য, আলোচনা, চলচ্চিত্র-আলোকচিত্র-পোস্টার প্রদর্শনী ইত্যাদি। গোটা '৮০-এর দশক জুড়ে কখনও সামরিক শাসন, কখনও সাম্প্রদায়িক মৌলবাদী তৎপরতা, কখনও সরকার-প্রশাসন বা ক্ষমতাধর গণবিরোধী ব্যক্তি-গোষ্ঠির বিরুদ্ধে এইসব নাট্য ও সাংস্কৃতিক শিল্পীরা সর্বাত্মক তৎপরতা চালিয়েছে। ওই সময়গুলোতে প্রায়ই দেখা যেত ফুটপাতে শিল্পীরা গাইছে 'জাগো অনশন বন্দি ওঠরে যতো' 'জনতার সংগ্রাম চলবেই' 'বিপবের রক্ত রাঙ্গা ঝাণ্ডা ওড়ে আকাশে'। কিংবা কোন জনসমাবেশের কেন্দ্রবিন্দু থেকে ভেসে আসছে নাট্যশিল্পীদের কণ্ঠস্বর,'জাগো বাহে, কোন্ঠে সবাই।' বিভিন্ন আসরে শোনা যেত আবৃত্তিশিল্পীদের মিলিত কণ্ঠ,'তোমরা কার দিকে গুলি ছুঁড়ছো' 'নামাও বন্দুক' 'এসো মিলি সমতার পবিত্র বিশ্বাসে।' নৃত্যের তালে তালে শোনা যেত,'আগুণের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে' 'এই শিকল পড়া ছল মোদের এই শিকল পড়া ছল'। হাটে-মাঠে-ঘাটে-বাঁকে সোচ্চার ছিল শিল্পীদের কণ্ঠ আর শিল্পকর্ম। সেই সময়গুলোতে রাজনৈতিক দলগুলোর অবদান ততোটুকুই বা ছিল। যা করেছিল এই শিল্পীরাই। এদের জন্যেই না পাবনায় মৌলবাদ, স্বৈরাচার আর শোষণ-শাসনবিরোধী বিস্ফোরন্মুখ অবস্থা তৈরি হয়েছিল। মানুষকে সচেতন করে আন্দোলনে নামিয়েছিল শিল্পীরা। শিল্পী হয়েও এরা সামরিক আইন ও জরুরি আইন ভেঙ্গেছিল, জেলে গিয়েছিল। সুতরাং এতোদিন পর এমন একটি দিনে সেইসব স্মৃতিময় মানুষ ও মাটিকে পাবো– এটা তো স্বর্গসুখের মতো।

হ্যাঁ, বসন্তে বনমালীর বিকেলটা জমে উঠেছিল উজ্জ্বল-আলোকিত মিলনমেলায়। চত্তরে বসেছিল সনমের গ্রন্থমেলা। ভেতরে অনুষ্ঠান। সভাপতি'র আসনে বসেছিলেন এমনই এক ব্যক্তিত্ব যিনি সারাটি জীবন ওপরের ওই আলোকিত সম্মুখযাত্রার ধারক এবং বাহক। তিনি হলেন শহীদ বুলবুল কলেজের অধ্যক্ষ শিবজিত নাগ। বরেণ্য প্রধান অতিথি– যিনি একাধারে মুক্তিযুদ্ধের শব্দসৈনিক, স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্রের বার্তা সম্পাদক, বাংলাদেশ বেতারের প্রথম মহাপরিচালক, শিল্পকলা একাডেমীর মহাপরিচালক, বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউটের পরিচালক, বাংলাদেশ গণশিল্পী সংস্থার সভাপতি এবং '৫২-'৬২ থেকে এখন পর্যন্ত গণমুখি সকল সাংস্কৃতিক আন্দোলনের পুরোধা কামাল লোহানী– তিনি ছাড়াও মঞ্চে উপবিষ্ট ছিলেন প্রবীণ শিক্ষাবিদ অধ্যক্ষ মুহাম্মদ নুরুন্নবী, প্রবীণ বুদ্ধিজীবী ও সাংবাদিক আনোয়ারুল হক, প্রবীণ শিক্ষাবিদ অধ্যাপক মনোয়ার হোসেন জাহেদী, স্বনামে খ্যাত কবি উমর আলী, মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ কামরুজ্জামান, শহীদ সাধন সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ আব্দুল মতীন খান, মা মুদ্রণের স্বত্বাধিকারী ও 'অপরাজিতার চোখ' গ্রন্থের প্রকাশক অমল কান্তি সরকার এবং আমি। মঞ্চের সামনে যারা দর্শকের আসনে বসেছিলেন তারা সাবাই ছিলেন পাবনার গুণিজন, বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব এবং সাংস্কৃতিক অঙ্গনের সংগঠক, কর্মী এবং অনুরাগী।

পাবনাতে এক সময় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান লেগেই থাকতো। কবিতার জনমুখি চর্চা হতো। জাতীয় দিবসগুলোতে ছেলে-মেয়েরা অনুষ্ঠানের পর অনুষ্ঠান করে যেতো। আর একুশের অগ্নিঝরা মাসে বাড়ি বাড়ি, ঘরে ঘরে শহীদ মিনার হতো। স্কুল, কলেজ, পাড়া, মহলা, ক্লাব ইত্যাদি জায়গায় পালা দিয়ে একুশ পালন করা হতো। প্রচুর স্মরণিকা বেরুতো, সংকলন বেরুতো। এখানে রুখবার শক্তি কারও ছিল না। কিন্তু তারপর কিছুটা শূন্যতা এসেছে। সময় গড়িয়েছে। অনেক সংগঠক এলাকা ছেড়েছেন। দেশে সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্প ছড়িয়ে পড়েছে। আঘাত এসেছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় এবং মতাদর্শে। ফলে সেই অনুষ্ঠান আর থাকেনি। সব

কেমন বিমূখ হয়ে উঠছিল। তাই ক্ষণিকের জন্য হলেও শঙ্কিত ছিলাম– কী দেখবো পাবনায়, কী দেখবো অনুষ্ঠানে, কারা থাকবেন সেখানে?

কিন্তু হতাশ হবার কিছু ঘটেনি। বরং নতুন করে উজ্জীবিত হওয়ার অনেক অনেক কিছু দেখেছি। দেখেছি তরুণ প্রজন্মের উৎসাহ-উদ্দীপনা, প্রত্যয়-অঙ্গীকার এবং নতুন শিখার আলোয় জ্বলে ওঠার দুঃসাহস। মঞ্চ থেকে বিশ্ব বাঙালি কবি রবীন্দ্র নাথ ঠাকুরের কবিতার উদ্ধৃতি দিয়ে বার বার করে বলা হচ্ছিল মানুষের প্রতি আস্থা হারানো পাপ। আস্থা হারাতে নেই। কারণ মানুষই আস্থার জায়গা, তারা লড়াই-সমাজ-সভ্যতা-এগিয়ে যাবার শক্তি। লড়াইয়ে কখনও এক পা পিছিয়ে দু পা এগুতে হয়। কাজেই হারবার কিছু নেই। সামনে এগিয়ে যেতে হবে ইতিহাসের পথ ধরে।

সুতরাং দেখা গেল বৈরি সময়ে যে লড়াকু সংস্কৃতি লড়েছে, বিজয় ছিনিয়ে এনেছে, সে সংস্কৃতিকে কখনও এক পা পিছুতেও হয়েছে এগুবার লক্ষ্যে। মনে হলো এখন সেই পিছিয়ে এগুবার সময়। এগুবার সময় সংস্কৃতি চর্চায়, নাটকে, গানে, অনুষ্ঠানে, প্রকাশনায়। এ সত্যটা ফুটে উঠলো অনুষ্ঠান মিলনায়তনে। দেখা গেল আবার আগের মতো অনেক প্রকাশনা। নতুন প্রজন্মের অনেক লেখক-প্রকাশক-শিল্পী প্রকাশ করেছেন সংকলন, কাব্যগ্রন্থ, কবিতাপত্র। পুরনোদের রচনা তো আছেই। এসব রচনা মঞ্চে এবং মিলনায়তনের ভেতর সকলের হাতে হাতে দেখা গেল। এ বাস্তবতা নিঃসন্দেহে আশা জাগানিয়ার, উৎসাহের এবং অঙ্গীকারের। সুতরাং বসন্তদিনের এই মিলনমেলা থেকেও হয়তো ছড়িয়ে পড়বে নতুন আশার আলো। অনুষ্ঠানমঞ্চ এমন ধারণাই দিয়ে গেল তার গণসূর্যকে আলোচনায়, ভাষণে, শপথে এবং কবিতা-গানে। গোটা মিলনায়তন তাই গেয়ে উঠেছিল শিল্পী প্রলয় চাকী ও অন্যান্যদের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে 'আমরা করবো জয় নিশ্চয়ই'।

- **আবুল হোসেন খোকন :** সাংবাদিক-কলামিস্ট, মানবাধিকার কর্মী।

প্রেরকের ঠিকানা :

(আবুল হোসেন খোকন)
৭/৮, বক- সি, লালমাটিয়া
ঢাকা-১২০৭।
ফোন : +88-01711-869897
ই-মেইল : ahkhokon@gmail.com